উপসংহার

প্রাগৈতিহাসিক পর্বে জাদুর সঙ্গে পা মিলিয়ে সেই যে হাঁটতে শুরু করেছিল মানুষ, তারপর বহু সময় পেরিয়েছে, অনেক পথ অতিক্রান্ত; তবু জাদুকে পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি তার পক্ষে। পরবর্তীতে জাদু থেকে তৈরি হয়েছে ধর্ম, আবিষ্কার হয়েছে বিজ্ঞান। তাদের সাথেও পাশাপাশি দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে জাদু। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের যাপনের প্রতিফলন ঘটে তার সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ফলে সময়ে-সময়ে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে মানুষের পরিবর্তিত সমীকরণটিও নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে সেই সাহিত্যের পাতায় পাতায়।

নবম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী—বাঙালির জীবনচর্যায় জাদুর বৃহৎ ভূমিকাটি আন্দাজ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না তার প্রাগাধুনিক সাহিত্যসম্ভারের দিকে তাকালে। সেখানে জাদুবিশ্বাসের একঘেঁয়ে গড্ডালিকাপ্রবাহ—প্রত্যেকটা জাদুক্রিয়া উঠে এসেছে অবশ্যফলদায়ী বিশ্বাসেই।

তারপর সাহিত্যে জাদুবিশ্বাসের এই একাধিপত্যের জায়গাটায় প্রথম ধাক্কা মারল আধুনিকতা। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে বিশাল পরিবর্তন এল বাঙালির মানসজগতে। ইংরেজি শিক্ষার মারফৎ এরা পাশ্চাত্য ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হল। ফলে জাদুর আবহটা ভাঙতে শুরু করল বিজ্ঞানবাদ। এবার মানুষ যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শুরু করল, বুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রভাবে জাদুবিশ্বাসকে ক্রমশ কোণঠাসা করার একটি প্রচেষ্টা দেখা গেল। কিন্তু ইংরেজ-সান্নিধ্যে আসার অনেক আগেই এই প্রবণতা খণ্ডিতভাবে লক্ষ করা গিয়েছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যে।

প্রায় সমস্ত মধ্যযুগীয় সাহিত্য জুড়ে জাদুর একচ্ছত্রতা সত্ত্বেও বেশ কিছু মানুষ ঐ সময়েও চলতি হাওয়ার উল্টো দিকে হেঁটেছিল। প্রথম দলটি ছিল কৃত্তিবাস-কাশীরাম-মালাধর বসু প্রমুখ অনুবাদ কবিদের। রামায়ণ মহাভারত পুরাণের বাংলায় অনুবাদ চতুর্দশ শতাব্দীতে সজোরে আঘাত করেছিল সংস্কৃতজ্ঞ উচ্চশ্রেণির অহংমন্যতায়, তাদের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে বের করে সেইসব সংস্কৃত সাহিত্য সাধারণ মানুষের মাঝখানে নামিয়ে আনায় খুব চটে গিয়েছিল সুবিধাভোগী মানুষগুলি। স্বার্থরক্ষার অন্তিম চেষ্টা হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল শাস্ত্রবাণীও—

'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।

ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরমং ব্রজেৎ।।'[১]

অর্থাৎ, 'অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামচরিতাদি গ্রন্থ যদি কেউ ভাষায় (মাতৃভাষায়) শোনে, তবে তাকে রৌরব নরক ভোগ করতে হবে।'[২]

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শুধু অনুবাদ কবিরা, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা নন, সাধারণ বাঙালিরাও অনুবাদ সাহিত্যকে হার্দিক উষ্ণতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। নরকভয়কে অগ্রাহ্য করবার এই দুঃসাহসের পেছনে কারণ হতে পারে তিনটি—

১। পৃষ্ঠপোষকরা বেশিরভাগ মুসলিম হওয়ায় তাদের মধ্যে রামচরিতাদি গ্রন্থ ও অষ্টাদশ পুরাণ সম্পর্কে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্পর্শকাতরতার জায়গাটা হিন্দুদের অনুরূপ ছিল না।

২। মুসলিম শাসনে ব্রাহ্মণতন্ত্র বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।

৩। নিম্নশ্রেণির যেসব হিন্দু বাঙালির জন্য এসব সাহিত্য অনূদিত হচ্ছিল, অসম্মান ও অমর্যাদার নারকীয় জীবন যাপন করতে করতে তারা শাস্ত্রের মাধ্যমে উচ্চ শ্রেণির চোখ-রাঙানিকে তাচ্ছিল্য করতে শুরু করেছিল। ধর্মান্তরিত হতে উৎসাহিত এই মানুষগুলির মধ্যে হিন্দু ধর্ম বা শাস্ত্র সম্পর্কে আর বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধাও অবশিষ্ট ছিল না।

দ্বিতীয়টি, দল নয়, জয়ানন্দ। পূর্ববর্তী আর পরবর্তী সমস্ত চৈতন্যজীবনীতে যেখানে চৈত্যনের মৃত্যুকে ঘিরে অলৌকিকতার অস্পষ্টতা তৈরি করা হয়েছিল, জয়ানন্দ জানিয়েছিলেন সম্ভাব্য 'বাস্তব'টি—

'আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।

ইটল বাজিল বাম পা'এ আচম্বিতে।।

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।

সেই লক্ষ্য টোটায় শরণ অবশেষে।।

পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।

কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলি সর্বথা।।'[৩]

'ভগবান' চৈতন্যকে ঘিরে এই লৌকিক কাহিনি পরিবেশনার জন্য বৈষ্ণব সমাজ জয়ানন্দকে কখনো ক্ষমা করেনি, তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' (১৫৬০ সাল) কাব্যটিকেও গ্রহণ করা হয়নি। চৈতন্যের জীবৎকালে জন্মগ্রহণ, চৈতন্য মাদকতাময় আবহে বেড়ে ওঠার পরও বৈষ্ণবীয় জাদুবিশ্বাস ভেঙে বাস্তবকে লিপিবদ্ধ করা, তাও আবার স্বয়ং চৈতন্য জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা কাব্যে—নিঃসন্দেহে জয়ানন্দকে এক ভিন্ন মাত্রা দেয়।

মধ্যযুগীয় এই সংকীর্ণ গবাক্ষপথে আকাশের দিকে তাকানো থেকে সরিয়ে এনে, আধুনিকতা, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিকে দাঁড় করাতে চেয়েছিল খোলা আকাশের নীচে। যুক্তি বুদ্ধি পরীক্ষা নিরীক্ষা—অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা চলতে লাগল জাদুবিশ্বাসকে। কিন্তু এক লহমায় পুরোপুরি বিপরীত মেরুকরণ কখনোই সম্ভব ছিল না। ফলে বঙ্কিম ও ত্রৈলোক্যের সাহিত্যে ধরা পড়ল জাদুবিশ্বাস ও জাদুবিশ্বাসবিরোধী উভয় চিন্তাচেতনাই। বেশ কয়েকটা জাদুবিশ্বাসকে তাঁরা প্রশ্ন করেছেন তাদের যৌক্তিকতা বিষয়ে; সদুত্তর না মেলায় তাদের সরাসরি খারিজও করেছেন। আবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাহিত বেশ কয়েকটি জাদুবিশ্বাসের মায়া

কাটিয়েও উঠতে পারেননি শেষপর্যন্ত। ফলে ঊনবিংশ শতকীয় ঔপন্যাসিকদের প্রশ্রয়ে বহাল তবিয়তে সেগুলি তাঁদের উপন্যাসে বিজ্ঞানবাদের পাশাপাশিই সহাবস্থান করেছে।

ভেতরে ভেতরে জাদুবিশ্বাসের লালন—বঙ্কিম, ত্রৈলোক্যের ঠিক এই অনুবৃত্তিটাই খুব তলায় তলায় বয়ে চলল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। সেখানে অলৌকিকতা জাদুবিশ্বাসের বিরোধে তাঁর কোনো অবস্থানই নেই। 'হতে পারে' জাতীয় একটি মানসিকতা কাহিনি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ধরলেন রূপান্তরের জায়গাটা; জাদুবিশ্বাস কাটিয়ে যখন বিজ্ঞানবাদে পৌঁছচ্ছে মানুষ। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে শুধুই বিজ্ঞানবাদ।

এই বিজ্ঞানবাদের জায়গাটা পরবর্তীতে বয়ে নিয়ে চললেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উপন্যাসে জাদুবিশ্বাসকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটি ধারা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল—

১। জাদুবিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানবাদে পৌঁছনোর পর্যায়—অর্থাৎ সন্ধিক্ষণটি

২। সরাসরি বিজ্ঞানবাদ দিয়ে আক্রমণ

৩। উপনিবেশোত্তর দৃষ্টিতে জাদুবিশ্বাস

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে যেহেতু প্রান্তিক পুরুলিয়ার কথা, তাই তিনি তারাশঙ্করেরই অনুবর্তন করলেন। এই সন্দর্ভে আলোচিত উপন্যাসগুলিতে দেখা যায়, জাদুবিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানবাদে পৌঁছনোর সময়পর্বটা তুলে ধরেছেন তিনি। সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র এবং অভিজিৎ সেনের কয়েকটি উপন্যাসে জাদুবিশ্বাসকে সরাসরি দাঁড় করানো হল বিজ্ঞানবাদের বিপরীতে। তাঁরা দেখালেন—

১। জাদুর 'লৌকিক' স্বরূপ

২। শিক্ষা-বিত্ত-পরিবেশ নিরপেক্ষভাবে প্রায় সবস্তরের মানুষের মধ্যে জাদুবিশ্বাসের অবস্থান

৩। জাদুর প্রতি এক শ্রেণির মানুষের বিশ্বাসকে ব্যবহার করে অন্য এক শ্রেণির মানুষের স্বার্থসিদ্ধি

এরপর উপনিবেশোত্তরবাদের প্রভাবে জাদু আবার রূপান্তরিত হয়ে পরিবেশিত হল ঔপনিবেশিক কাঠামোকে অগ্রাহ্য করার জন্য। নবারুণ তাঁর উপন্যাসে জাদুবিশ্বাসকে আর বিজ্ঞানবাদ দিয়ে বিচার করলেন না। 'ওপরতলা'য় বারবার ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও 'নিচেরতলা'য় যে মানুষগুলো চিরদিনই একইরকমভাবে অন্ধকূপে নির্বাসিত হয়ে আছে, তাদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। ফলে তাঁর উপন্যাসে কাহিনিগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যে জাদুচর্চাকারী ও জাদুবিশ্বাসীদের প্রতিই পাঠক সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। জাদুবিশ্বাস তাঁর কাহিনিতে উঠে এল ঔপনিবেশিক-প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দেখালেন জাদুনির্ভর মানুষগুলির উপরে কেমন নির্বিচারে শোষণ ও অত্যাচার চালাল পুঁজিবাদ, বিজ্ঞানবাদ।

১। শোষিত শক্তির ঔপনিবেশিকতা-প্রতিরোধী জাদুবিশ্বাসকে ব্যবহার করে তাদের প্রত্যেককে মেরে ফেলল ঔপনিবেশিক শক্তি

২। ঔপনিবেশিক প্রভুদের রসনাতৃপ্তি করতে দেশীয় সংস্কৃতিকে বিকৃত করে অর্থ ও যশ পাওয়ার চেষ্টা করল ঔপনিবেশিকতা প্রভাবিত শোষিত শক্তি

৩। নির্বিরোধী এক জাদুচর্চাকারীকে খুন করল বিজ্ঞানবাদ, পুঁজিবাদ

৪। শোষকশক্তি থেকে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটল প্রলেতারিয়েতদের কাছে। তাদের হাতে জাদুক্ষমতা তুলে দিয়ে শোষকশক্তিকে বিভ্রান্ত করে তুললেন নবারুণ ভট্টাচার্য। এতদিন ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষরা বুঝতেই পারল না তাদের কাঠামোর সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে কোন্ দিক দিয়ে কীভাবে আক্রমণটা আসবে

৫। শোষক শক্তির বাতিল করে দেওয়া একটি মানুষ—শোষিত শক্তির প্রতিভূ, জীবিকা অর্জন করতে শুরু করল শোষক শ্রেণিকে শোষণ করেই

কিন্তু বিশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্ধের অনেক আগেই এ লক্ষণের একঝলক চোখে পড়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী'তে। ঔপনিবেশিক প্রভুদের শিক্ষায় শিক্ষিত শচীন্দ্র যখন জাদুচর্চাকারী সন্ন্যাসীর কাছে তার 'নলচালনা-জাদু'টির যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, সন্ন্যাসীটি সরাসরি আঙুল তুলেছিল ঔপনিবেশিক প্রভুদের শিক্ষা, কার্য এবং আবিষ্কারের দিকে—

'শুনিয়াছি, বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহা আমি মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া, কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার সঙ্কেত অদ্যপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা?

সন্ন্যাসী। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজ জানে না, তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুত তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন।'[৪]

শুধুমাত্র এটুকুতেই ক্ষান্ত থাকেননি বঙ্কিম। এই সন্ন্যাসীটির জাদুপ্রক্রিয়াকে সফল করে দৃষ্টিক্ষমতা ফিরিয়ে এনেছেন আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে অনারোগ্য জন্মান্ধ রজনীর। প্রাচ্যের সন্ন্যাসীর জাদুক্ষমতাকে পাশ্চাত্যের 'আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে'র সঙ্গে সরাসরি তুলনা করে, বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন তাকে।

এ যেন উপনিবেশোত্তর চিন্তাচেতনায় জারিত হয়ে ঔপনিবেশিকতার প্রতিরোধে নিজ অতীত ঐতিহ্যের জাদুবিশ্বাসকে হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরা। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি উপন্যাসে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার পাশাপাশি ঔপনিবেশিকতা-প্রতিরোধী ভাবনাও সহাবস্থান করছিল সেসময়। কেননা, ঔপনিবেশিক প্রভুশাসিত উপনিবেশে

ঠিক যে সময় থেকে ঔপনিবেশিক-ভাবধারায় মানুষ জারিত হতে শুরু করেছিল, ঠিক তখন থেকেই এক শ্রেণির মানুষের ভেতরে তৈরি হচ্ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উপনিবেশিক-প্রতিরোধ প্রবণতা। সমাজে এমনও কিছু শ্রেণি ছিল যারা ঔপনিবেশিকধারার বিপরীত পূর্বের দেশীয় ধারাটাকে টিকিয়ে রেখে প্রতিবেদন রচনা করত। সেই ধারাতেই জোয়ার আনল ঔপনিবেশোত্তর চেতনা।

এই সন্দর্ভে আলোচিত উপন্যাসগুলি পাশাপাশি সাজালে অনেক ক্ষেত্রেই স্থান-কাল-কলমভেদে বারবার দুটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়—

১। একটি জাদুবিশ্বাস দুটি পৃথক উপন্যাসে পৃথকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

২। একটি জাদুবিশ্বাস দুটি পৃথক উপন্যাসে একইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

যেমন,

তুকতাক, বশীকরণ-

প্রাগৈতিহাসিক বাংলা সাহিত্যে তুকতাক, বশীকরণের নিদর্শন পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, রূপরাম ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, বিদ্যাপতির পদাবলীতে। সন্দেহের কোনো জায়গা নেই সেখানে এসব জাদুক্রিয়া ঘিরে। কিন্তু ঊনবিংশে 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমচন্দ্র স্বামী বশীকরণের জন্য কপালকুণ্ডলার ননদের প্রচেষ্টাটুকু জানালেও ফলাফল সম্পর্কে মুখ খুললেন না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ স্বামীর পরস্ত্রীগমন আটকাতে জনৈকা রমণী ভ্রমরকে বশীকরণ জাদুপ্রয়োগের উপদেশ দিল। 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতিতে বশীকরণ কেবল কথার পিঠে কথা হিসেবেই লঘুভঙ্গিতে উপস্থাপিত হল। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পাপের পরিণাম'-এ আবার ফিরে এল তুকতাক। তখন কিন্তু তার কার্যক্ষমতার সম্ভাব্যতার বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধোঁয়াশা নেই চারপাশে। ত্রৈলোক্য সরাসরি দেখালেন, সমাজের বাকি মানুষগুলোর জাদুবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কীভাবে একটি শ্রেণি ভয় দেখিয়ে অর্থোপার্জন করে। নিজেই রাস্তাঘাটে, বাড়ির সামনে তুকে ব্যবহৃত সামগ্রী ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলোর জাদু থেকে মানুষকে বাঁচানোর বিনিময়ে আখের গুছিয়ে নেয় গৌরবী তিওরণী। অর্থাৎ তুকতাকের পেছনের

সত্যটাকে পাঠকের সামনে মেলে ধরলেন বিজ্ঞানবাদ-প্রভাবিত ত্রৈলোক্য। পরবর্তীতে ঠিক এই পথে হাঁটলেন ভগীরথ মিশ্র। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা হল 'জানগুরু'। তুকতাক প্রভৃতি জাদুক্রিয়ার প্রতি সাধারণের বিশ্বাসকে ব্যবহার করে এবার শুধু জাদুচর্চাকারীরা নয়, স্বার্থসিদ্ধি করতে দেখা গেল সমাজের বিত্তবান ও প্রভাবশালী মানুষদেরকেও। তুকতাক করে মানুষের ক্ষতি করছে এমন অভিযোগ তুলে এক একজনকে 'ডাইনি' সাব্যস্ত করে, কখনো জরিমানা, কখনো খেদিয়ে দেওয়া, কখনো বা হত্যা পর্যন্ত করা হতে লাগল। ঔপন্যাসিক দেখালেন, জানগুরুদের মোটা টাকার ঘুষ দিয়ে, তাদের দিয়ে সমাজের প্রভাবশালীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথের কাঁটাগুলোকে ডাইনি বা জাদুচর্চাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'কাঙাল মালসাট'-এও এল তুকতাক, বশীকরণ প্রসঙ্গ। সেখানে ভদির স্ত্রী বেচামণি ভদিকে বশ করতে ঘুমের মধ্যেও বশীকরণের মন্ত্র আওড়ায়। ভদির বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় শুধুমাত্র তুকতাক জাতীয় জাদুক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য। 'কাঙাল মালসাট'-এর কাহিনিজগৎ একেবারে ভিন্ন। উপনিবেশোত্তর চেতনায় প্রভাবিত হয়ে নবারুণ শোষিত শ্রেণিটির হাতে জাদুদণ্ড তুলে দিয়েছেন। আর তারপর চোক্তার ফ্যাতাড়ুরা যা-কিছু করেছে আসলে সবই ক্ষমতাশালী শোষক শক্তিটির গড়ে দেওয়া নিয়মবিধির পরিপন্থী। জাদুশক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রান্তিকায়িত শ্রেণিটি ঔপনিবেশিক কাঠামোকে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করেছে, আর তাদের সেই আক্রমণের ধরণ-ধারণ আদব-কায়দা একেবারে নিজেদের নিয়মপ্রসূতই। ফলে জাদুবিশ্বাস সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে ঔপনিবেশিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে।

জাদুচর্চাকারীদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস—

'রজনী', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসে অলৌকিক ক্ষমতাধর সন্ন্যাসী চরিত্রের দেখা মেলে। ঔপন্যাসিক তাঁর কোনো কাহিনিতেই এঁদেরকে ন্যূন করেননি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের জাদুক্রিয়াকে সফল করা হয়েছে এবং যুক্তিবাদী বিজ্ঞানবাদী চরিত্রগুলিকেও জোর করে নোওয়ানো হয়েছে জাদুবিশ্বাসের সামনে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ফোক্‌লা দিগম্বর'-এ আবার অন্য ছবি। সেখানে

সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতায় অবিশ্বাসীচরিত্রের শুধু আমদানিই করা হয়নি, পাশাপাশি সন্ন্যাসীর জাদুক্রিয়ার পিছনের সত্যিটাকেও তুলে আনা হয়েছে। ফিসফিস করে কুসীর কানের কাছে কোনো জাদুমন্ত্র নয়, বরং নিজের পরিচয় দিয়েছিল বাবু। আর নিজের স্বামীকে ফিরে পেয়ে কুসীর শ্বস্ত সুস্থ হয়ে ওঠার পেছনে আদৌ কোনো জাদুক্রিয়া ছিল না। জাদুচর্চাকারীর অলৌকিক ক্ষমতায় সাধারণের এই বিশ্বাস উঠে এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র যাদব চরিত্র এবং অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'-এর গুণমান কবিরাজ চরিত্র দুটি ঘিরে। দুটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানবাদের পথে হেঁটেছেন দুই ঔপন্যাসিক। নবারুণের 'হারবার্ট', 'কাঙাল মালসাট', 'মসোলিয়ম', 'খেলনানগর', 'ভোগী'তে এই বিশ্বাসই উপনিবেশোত্তর চেতনায় জারিত হয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাদুবিশ্বাসের তুলনা—

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির মানসজগতে সঞ্চারিত হওয়া আধুনিকতা আসলে সম্পূর্ণটাই ছিল ঔপনিবেশিকপ্রভাবসঞ্জাত। ফলে প্রতিটি মুহূর্তেই তারা নিজেদের বিশ্বাস সংস্কারগুলি পাশ্চাত্য বিশ্বাসের মানদণ্ডে রেখে বিচার করে গ্রহণ-বর্জন করত। ফলে বঙ্কিমের 'সীতারাম' এবং ত্রৈলোক্যের 'পাপের পরিণাম'এ সেই প্রবণতার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। নবারুণের 'হারবার্ট'-এও এনেছেন এ জাতীয় তুলনা। কিন্তু বঙ্কিম ও ত্রৈলোক্য যেখানে পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রাচ্যের বিশ্বাসগুলিকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন, নবারুণ দেখালেন পাশ্চাত্যের আত্মা-নামানোর পথগুলো থেকে তাঁর হারবার্ট কতটা স্বতন্ত্র। আর ঔপনিবেশিক ধারার অনুগামী নয় বলেই তাকে আক্রমণ করল ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানবাদীরা।

জাদু-সম্মোহন—

বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর'-এ যে সম্মোহন দেখা যায়, সেটি আবার এল নবারুণের 'কাঙাল মালসাট'-এ। বৈজ্ঞানিক সম্মোহন ছেড়ে জাদু-সম্মোহনের দিকে বঙ্কিম যেমন কয়েক কদম এগিয়ে গেছেন, তেমনি এগিয়েছেন নবারুণও। রমানন্দ স্বামীর কমণ্ডলুস্থিত মন্ত্রপূত জলে সম্মোহিত শৈবলিনী এমন অনেক তথ্য জানিয়েছে, যা তার নিজেরই

জানার কথা নয়। আর নলেনের জাদুতে সম্মোহিত ফ্যাতাড়ুরা তাকে অনুসরণ করে ভদির বাড়ি আসবার সময় কেবল তার চলার পথটুকু নয়, হাঁটার ভঙ্গি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনকেও নকল করে গেছে আগাগোড়া। তবে দুটি ক্ষেত্রে সম্মোহন জাদুক্রিয়ার এই ব্যবহার সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে। অতীত ঐতিহ্য, বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতি মোহ থেকে কাহিনিতে জাদু-সম্মোহন নিয়ে এসেছেন বঙ্কিম, আর নবারুণের 'কাঙাল মালসাট'-এ শোষিত শ্রেণি জাদুক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে শোষক শ্রেণিকে জব্দ করতে। অর্থাৎ এখানে জাদু-সম্মোহন এসেছে ঔপনিবেশিকতার প্রতিরোধে।

শিক্ষা ও বিজ্ঞানবাদী মতাদর্শের অনুগামিতা সত্ত্বেও জাদুচর্চা, জাদুনির্ভরতা—

মনে পড়তে পারে আনন্দমঠের মহেন্দ্রের কথা; বঙ্কিম সত্যানন্দের জাদুক্ষমতা শেষ পর্যন্ত মানিয়ে ছেড়েছেন এই যুক্তিবাদী যুবকটিকে। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিকমনস্ক ডাক্তার শচীন্দ্র এবং অমরনাথকেও 'রজনী' উপন্যাসে জাদুক্রিয়া দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বঙ্কিম। "না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য।"[৫] জন্মান্ধ রজনীর দৃষ্টিক্ষমতা জাদুচিকিৎসায় ফিরিয়ে এনেছেন সন্ন্যাসীকে দিয়ে। ফলে যুক্তিবাদী এই দুই যুবকেরও বিশ্বাস জেগেছে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও সম্ভব-অসম্ভবের টেনে দেওয়া সীমারেখার বাইরেও জাদুদুনিয়ার কার্যক্ষমতার প্রতি। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় শচীন্দ্র চরিত্রটি। প্রেয়সী রজনীর অন্ধত্বের চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক পথে সম্ভব নয় জেনে সে জাদুচিকিৎসার সাহায্য নিতে আর কুণ্ঠিত হয়নি। এই দিকটিকেই বারবার উপন্যাসে তুলে এনেছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায়। 'মাটির অ্যান্টেনা'র টুনি, 'ধরিত্রী'র অঙ্কের শিক্ষিকা প্রণতি নাগ, 'পক্ষবিপক্ষ'-এর 'ভদ্দর লোকেরা'[৬] আরোগ্যপ্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতির পাশাপাশি জাদুচিকিৎসাকেও ব্যবহার করেছে। আর এ প্রসঙ্গে 'ধরিত্রী'তে ঔপন্যাসিক বলেই দিয়েছেন, জাদুচিকিৎসা রোগীকে মানসিকভাবে রোগপ্রতিরোধে সাহায্য করছে। অর্থাৎ জাদুচিকিৎসা একজাতীয় মনোচিকিৎসাই। ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি'তে ভিখারি ভকত, 'অন্তর্গত নীলস্রোত'-এ গুরুপদ,

'শিকলনামা'র নৃপেন ডাক্তারকেও একইভাবে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ও জাদুচিকিৎসাকে একসঙ্গে ব্যবহার করতে দেখা যায়। বস্তুত, শিক্ষা, বিত্ত কিংবা কোনো বিশেষ মতাদর্শের পতাকাবাহীর পরিচয়ও যে মানুষের মনের এই জাদুনির্ভরতাটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সাত পুরুষ ডট কম', 'কী বলে মৃত্যুলগ্নে', কিংবা 'ধরিত্রী' উপন্যাসে সে নিদর্শন ভূরি ভূরি। উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্তের মানুষদের সেখানে সৌভাগ্যপ্রদায়ী নানান পাথরের আংটি ধারণ করতে দেখা যায়। যাবতীয় জাদুবিশ্বাস সংস্কারের পরিপন্থী হিসেবে দল কাজ করলেও, সেই দলের সদস্য হয়ে 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'-এর বিষ্ণুপদকে দেখা যায় জাদুচর্চাকারী গুণমান কবিরাজকে মনে মনে সমর্থন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে। বামপন্থী দলের অনুগামী পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু' ছতর বাউরী জাদুচর্চা ছাড়তে পারে না। দিব্যি সেই ভড়ংয়ে লোক-ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করতে থাকে সে, সমাজে নিজের প্রভাবটা আরো বাড়িয়ে চলে।

ভূত—

ভূত দেখা যে আসলে ভুল দেখা—বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সৈকত রক্ষিত—প্রায় সকলের কাহিনিতেই তা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমের 'মৃণালিনী', ত্রৈলোক্যনাথের 'পাপের পরিণাম', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর', ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু', সৈকত রক্ষিতের 'স্তিমিত রণতূর্য'—সর্বত্রই যুক্তি বুদ্ধি পরীক্ষা নিরীক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদ দিয়ে ভূত তাড়ানো হয়েছে। ভিন্‌পথে হেঁটেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবারুণ ভট্টাচার্য। বিভূতিভূষনের 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান' দুটোতেই মৃত ব্যক্তিদের আনাগোনা। মৃতরা এসেছে নবারুণের 'কাঙাল মালসাট'-এও। তবে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ভৌতিক বিশ্বাসকে একপ্রকার মান্যতাই দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। আর নবারুণে ইংরেজ ভূতেরা এসেছে উপনিবেশ দশা অতীত হয়ে যাবার পরেও প্রাক্তন উপনিবেশের মনে বেঁচে থাকা ঔপনিবেশিকতার রূপক হিসেবে। ব্রিটিশরাজ অতীত হয়ে যাবার পরেও ব্রিটিশ অনুশাসন বিদেহীর মত মিশে আছে

প্রাক্তন উপনিবেশের জীবনে যাপনে—'কাঙাল মালসাট'-এ বিলিতি ভূতেদের আমদানি করা হয়েছে সেটা বুঝিয়ে দিতেই।

দিব্যদৃষ্টি—

জাদুবিশ্বাসকে বিজ্ঞানবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ত্রৈলোক্যনাথ সবক্ষেত্রে তাকে প্রতিহত করতে পারেননি। যেমন 'পাপের পরিণাম'-এ তিনি দিব্যদৃষ্টির বিশ্বাসটাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। শুধু দিব্যদৃষ্টি নয়, তিনি মৃত্যুর আগে মানুষের দিব্যশ্রবণক্ষমতা প্রাপ্তিতেও দৃঢ় বিশ্বাসী। এই একই বিষয় লক্ষ করা যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসটিতেও। সেখানে জিতু এমন অনেক কিছু দেখতে পায়, যা সাধারণের দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব নয়। উপনিবেশোত্তর চেতনায় জারিত হয়ে এই দিব্যদৃষ্টিক্ষমতা উঠে এসেছে নবারুণ ভট্টাচার্যের ফ্যাতাড়ু-চোক্তারের কাহিনিগুলিতেও।

জাদুবিশ্বাস থেকে ক্রমশ যুক্তিবাদ বিজ্ঞানবাদে উত্তরণ—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় সৈকত রক্ষিতের 'হে গরামথান' উপন্যাসটিতে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'—দুটি ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিকদ্বয় দেখান, মানুষের মনের মধ্যে **'অলৌকিক ক্ষমতাধর'দের মৃত্যু ঘিরে একটা অন্যরকম অস্বাভাবিক কোনো পরিণতির আশা** থাকে। তাই যাদব পণ্ডিতের স্বেচ্ছামৃত্যুর খবর দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল আর গুণমান কবিরাজের অত্যন্ত 'সাধারণ' মৃত্যুটাতে অবাক হয়েছিল তার শিষ্যরা। তাদের ভেতর অলৌকিক শক্তিধর গুণমানকে ঘিরে যে বিশ্বাসটা তৈরি হয়েছিল, তাতে তারা একরকম নিশ্চিত ছিল, সে মৃত্যু বিশেষভাবে আসবে। 'আসলে কবিরাজের মরাটা একটা বিশেষ ঘটনা হবে, তার শিষ্যরা এরকমই বলত বা আশা করত। সে সময়ে আকাশে আগুনের গোলা লাফ দিয়ে উঠবে অথবা তার বাড়ির উঠানের তেঁতুল গাছটা আকাশ পথে উড়তে শুরু করবে কোন্ নিরুদ্দেশে। গাছের আকৃতিতে মাটিতে প্রোথিত থাকলেও আসলে

সেটা গাছ নয়। কবিরাজের সঙ্গে যে রহস্যময় জগতের নিত্য সম্পর্ক, সেই জগতের কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কবিরাজ গাছ বানিয়ে রেখে দিয়েছে তার উঠানে।'[৭]

ভক্তদের এই অন্ধ শ্রদ্ধা ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে দেখা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র যাদব পণ্ডিত-পাগলদিদির, আর ভগীরথ মিশ্রের 'শিকলনামা' উপন্যাসের খুদির মায়ের। মুখ দিয়ে অসাবধানে বেরিয়ে যাওয়া নিজের মৃত্যুদিনটাতেই মরতে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে সস্ত্রীক যাদব পণ্ডিত। সেদিন মারা না গেলে রটে যাওয়া 'ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন' যাদব পণ্ডিতের ইচ্ছামৃত্যু ক্ষমতা ঘিরে সংশয় দেখা যেত অগুনতি ভক্তের। একইরকমভাবে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত শরীরে কাঁটা বিঁধিয়ে বিধিঁয়ে নিজের ব্যথাহীনতাকে কাজে লাগিয়ে যে খুদির মা নিজের শরীরে কালীর বসত নিয়ে গল্প ফেঁদে ভক্তদের বিশ্বাস আদায় করেছিল, তার পক্ষে পরবর্তীতে নিজের কুষ্ঠরোগের সত্যতাটা স্বীকার করে নেওয়া আর সম্ভব হয়নি। ভক্তদের ভক্তি, আনুগত্য হারিয়ে ফেলবার ভয় থেকে, রোগ প্রকট হলে প্রথমে আত্মগোপন করে ছিল খুদির মা; পরবর্তীতে লোকলজ্জার হাত থেকে মাকে বাঁচাতে ও নিজে বাঁচতে খুদিকে খুন করতে হয় নিজের মায়ের।

নবারুণ ভট্টাচার্যের 'ভোগী' আর ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসদুটির বক্তব্য এক। দুটি ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক প্রভুদের মনোমতো করার জন্য গৌতম ও রাজীব **দেশীয় সংস্কৃতিকে বিকৃত করে বিদেশের দরবারে উপস্থাপিত** করে।

এছাড়াও **অত্যাচার থেকে বাঁচতে ভূতে ধরার অভিনয় করা, প্রতিশোধ নিতে অন্যকে অশুভশক্তির অধিকারী সাজানো, জাদুবিশ্বাসের সুযোগে বিশ্বাসীদের শোষণ শাসনের উদাহরণ** উপন্যাসগুলিতে ভূরি ভূরি।

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে, প্রাগাধুনিক সাহিত্য থেকে আধুনিক উপন্যাসের ধারায় জাদুবিশ্বাসের পরিগ্রহণ ও উপস্থাপন কীভাবে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে, তার পথরেখাটি নির্মাণ হয়ে যায়। আর সেখানে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলার দেশীয় সংস্কৃতির ওপর

দিয়ে আধুনিকতা, উত্তর ঔপনিবেশিকতার ঢেউ বয়ে গেলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক পর্যায়ে জাদুবিশ্বাস রয়েই গেছে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আসলে সেই প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকেই জাদুবিশ্বাস এমনভাবে মানুষের জীবনে ও যাপনে মিশে গিয়েছিল, যে, সাহিত্যে বাস্তবতাকে তুলে আনতে গিয়ে আর কখনোই বাদ দেওয়া গেল না তাকে।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য							
	সংস্পর্শমূলক	**অনুকৃতিমূলক**	**তত্ত্বগত**	**শুভকারী**	**অশুভকারী**	**প্রবর্তক**	**নিবর্তক**
চর্যাপদ	✓	✓		✓		✓	
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন		✓	✓	✓	✓	✓	✓
অনুবাদ সাহিত্য	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
মঙ্গলকাব্য	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
চৈতন্যজীবনীসাহিত্য	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বৈষ্ণব পদাবলী	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
রোসাঙ রাজসভার সাহিত্য	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ঊনবিংশ শতকের উপন্যাস							
	সংস্পর্শমূলক	অনুকৃতিমূলক	তত্ত্বগত	শুভকারী	অশুভকারী	নিবর্তক	প্রবর্তক
বঙ্কিমচন্দ্র	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ত্রৈলোক্যনাথ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

বিংশ শতকের প্রথমার্ধের উপন্যাস							
	সংস্পর্শমূলক	অনুকৃতিমূলক	তত্ত্বগত	শুভকারী	অশুভকারী	প্রবর্তক	নিবর্তক
বিভূতি	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
তারাশঙ্কর	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
মানিক	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও একবিংশ শতকের উপন্যাস							
	সংস্পর্শমূলক	অনুকৃতিমূলক	তত্ত্বগত	শুভকারী	অশুভকারী	প্রবর্তক	নিবর্তক
অভিজিৎ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ভগীরথ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
নবারুণ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
সাধন	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
সৈকত	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(উল্লেখ্য, উপরোক্ত ছকটি শুধুমাত্র এই সন্দর্ভে গৃহীত উপন্যাসগুলির নিরীখেই তৈরি করা হয়েছে।)

বিজ্ঞানে পৌঁছনোর অনেক আগে থেকেই মানবসভ্যতার সঙ্গে যেমন অপরিত্যজ্যভাবে জড়িয়ে ছিল জাদু, সাহিত্যে যখন উঠে এল, তখন সেখানেও দখল করে নিল গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি। প্রাগাধুনিকতা, ঔপনিবেশিকতা, আধুনিকতা, উত্তর ঔপনিবেশিকতা—নবম থেকে একবিংশ শতাব্দী—মানুষের নির্ভরতা, দ্বন্দ্ব, দোলাচলতা, ঘাত প্রতিঘাত, প্রতিরোধের কেন্দ্রে উজ্জ্বলভাবে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রকের মত অবস্থান করতে থাকল সে। দিনবদলের সাথে সাথে মানুষের চশমাবদল হল। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা, উত্তর-ঔপনিবেশিকতা—যে রঙের কাঁচই ধরা হল চোখের সামনে, ওপারের দৃশ্যগুলি কীভাবে কোন্ কোন্ দিক থেকে বদলে যাচ্ছে, তা তুলে ধরতে ঔপন্যাসিকরা কাহিনিতে জাদুবিশ্বাসকে আনতে বাধ্য হলেন। ২৫ লক্ষ বছরেরও আগে থেকে[৮], আজ, এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের জীবনে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে সিংহভাগ অধিকার করে

রইল জাদু। অপরিত্যজ্যভাবে পরিবর্তিত সময় ও বিবর্তিত সমাজের বুকে বেঁচে থাকল লোকসংস্কৃতির এই জীবন্ত জীবাশ্ম।

তথ্যসূত্র:

1. ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র। *সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, প্রথম খণ্ড,* জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা ৯, ২০০১, পৃ ২৬৩
2. তদেব, ২৬৩
3. তদেব ১৯৬
4. বসু, বিষ্ণু (ভূমিকা), *বঙ্কিম রচনাবলী,* তুলি কলম, কলকাতা ৯, ১৯৮৬ পৃ- ৪৭৫-৭৬
5. তদেব। পৃ ৪৯২
6. *সাধন চট্টোপাধ্যায় রচনাবলী ২য় খণ্ড,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, ২০১২, পৃ ৪২
7. সেন, অভিজিৎ। *একের মধ্যে পাঁচ,* জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা ৭৩। ২০১৪, পৃ ৩০১
8. সেনগুপ্ত, পল্লব। *পূজা-পার্বণের উৎসকথা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, জানুয়ারি ২০০১, পৃ ৫২